International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 684-691
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.095

পাল লিপিমালায় প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

আয়েশা আক্তার
পি.এইচ.ডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

Received: 02.07.2025; Accepted: 08.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The period between the ancient and medieval periods, especially the pala period (c. 750 AD. to 1161 AD) is an important chapter of the history of Bengal. At this time, Bengal became the first political unity and a significant awakening in religion, education, literature and culture. The script especially inscriptions, copperplate inscriptions and manuscripts serve as a reliable primary source. This article outlines the society and culture of Bengal at that time through a detailed analysis of the language, content and context of the Pala script.

Keywords: Pala Dynasty, Pala inscriptions, History of ancient Bengal, Society of ancient Bengal, Cultural history in ancient Bengal.

ভূমিকা:

প্রায় চারশ বছর স্থায়ী পাল বংশের শাসন বাংলায় একটি সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠা করে। যা বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। বলা চলে পাল রাজাগণ একটি সফল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পাল শাসন আমলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারত, স্বতন্ত্র, সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক ঐক্যে আবদ্ধ হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ ও গবেষকগণ মনে করেন বাংলায় পাল শাসনামল ছিল প্রজা বৎসল ও জন কল্যাণকর। দীর্ঘ চারশত বছরের পাল শাসন আসলে সতের জন শাসকের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ধর্মপাল (আ.৭৮১-৮২১খ্রি.), দেবপাল (আ.৮২১-৮৬১খ্রি.), প্রথম শুরপাল (আ.৮৬১-৮৬৬খ্রি.), ও প্রথম বিগ্রহ পাল, নারায়ণপাল (আ.৮৬৬-৯২০খ্রি.), রাজ্য পাল (আ.৯২০-৯৫২খ্রি.), দ্বিতীয় গোপাল (আ.৯৫২-৯৬৯খ্রি.), প্রথম মহীপাল (আ.৯৯৫-১০৪৩খ্রি.), নয়পাল (আ.১০৪৩-১০৫৮খ্রি.), তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ.১০৫৮-১০৭৫খ্রি.), রামপাল (আ.১০৮২-১১২৪খ্রি.), মদনপাল (আ. ১১৪৩-১১৬২খ্রি.) এর শাসনকাল ছিল উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের দীর্ঘ শাসন বাংলায় এক ধরণের উদার ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করে। যার অন্যতম উদাহরণ এ আমলে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রীতি ও সহাবস্থান, ধর্মক্ষেত্রেও উদার নীতি পরিলক্ষিত হয়। রাজকার্যে উচ্চ পদে নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠাপোষকতা শাসক বর্গের বিচক্ষণতার পরিচায়ক। ফলে প্রাচীন বাংলায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরদের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস পায় এবং পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতার কারণে নতুন নতুন আচার পদ্ধতির উন্মেষ ঘটে। ক্রমান্বয়ে বাংলায় বৌদ্ধদের মধ্যে তান্ত্রিক মতবাদ ও রীতিনীতির জন্ম হয়। পালযুগের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিমন্ডল পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের মনোভাব বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বহুবিধ সাফল্যের জন্য ও পাল যুগ গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্যরীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে। এ স্থাপত্যরীতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের পরবর্তী স্থাপত্য কাঠামোকে প্রভাবিত করে। বাংলার পোড়ামাটির ফলক শিল্প এ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। পালদের ভাস্কর্য শিল্প পূর্ব ভারতীয় শিল্প রীতির একটা বিশেষ পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়। পাল যুগেই বাংলার ভাস্করগণ তাদের শৈল্পিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। এ যুগের সাহিত্য কর্মের অতি সামান্য অংশই কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম প্রাচীন বাংলার

ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দশম ও এগারো শতকের কবিদের রচিত অনেক শ্লোক বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবির ইঙ্গিত দেয়। পাল যুগের সকল সাফল্যের বিষয় বিবেচনা করে পাল যুগকে সংগত কারণেই বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ হিসেবে গণ্য করা যায়।

সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণীবিন্যাস:

পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁদের শাসনামলে বাংলার সমাজে ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পাল লিপিতে দানপত্র ও রাজদন্ড ঘোষণায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-ব্রাহ্মণ, বণিক, কৃষক, কারিগর এবং শ্রমিক শ্রেণী। পাল যুগে রাষ্ট্রই ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও পালক এবং বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই ছিল।[১] ''মেদ'' ''অনধ্র'' ''চন্ডাল'' ইত্যাদি শ্রেণীর উল্লেখ্য থেকে বোঝা যায় যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রভাব তৎকালীন সমাজে প্রবল ছিল। দেবপালের মুঙ্গের লিপিতে বলা হয়েছে, ''ধর্মপাল শাস্ত্রার্থের অনুবর্তী শাসনকৌশলে বিচলিত (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।''[২] আমগাছি লিপি তে ও তৃতীয় বিগ্রহ পালকে 'চাতুবর্ণ-সমাশ্রয়' বা বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] চর্যাপদে (আ. ৯৫০-১২০০খ্রি.) বাংলার ডোম, চন্ডাল ও শবরদের উল্লেখ আছে।[৪] পাল লিপিমালা গুলোতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ যেমন পালযুগের সামাজিক উদার দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচায়ক তেমনি বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের অনুল্লেখ একথাই বোধ হয় প্রমাণ করে যে পাল আমলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না।[৫]

প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে ভূমিসংক্রান্ত লিপিমালাসমূহ। এসব দলিলে রাষ্ট্রের অনুমোদনে ভূমির আদান-প্রদান লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যা থেকে একটা সংঘবদ্ধ সমাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬]

পাল লিপিমালা হতে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজে বর্ণ বিন্যাস ও শ্রেণী বিন্যাস সুবিন্যস্তভাবে ছিল। বর্ণশ্রম ব্যবস্থার প্রভাব তৎকালীন সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে কিছুটা সহনশীল ছিল। ফলে নিম্নতর বর্ণের জনসাধারণের সমাজে এবং রাজনীতিতে কিছু ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল। বাংলার সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থাকলেও অন্যান্য বর্ণ ও শ্রেণী এমনকি অস্পৃশ্যদেরও স্বীকৃতি ছিল।

লিপিমালাসমূহ হতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বিশাল জমিদান, নগর বা গ্রামের কর মওকুফ করার তথ্য পাওয়া যায়, যা-সমাজে ধর্মীয় ব্যক্তিদের মর্যাদার পরিচায়ক। পাল রাজাদের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণদের নিকট দানের নিমিত্তে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গ্রাম দান করা হত। এ সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন-

> ''পাল রাজাদের জ্ঞাত দানসমূহ যেগুলো সম্পূর্ণ গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত এবং ব্রাহ্মণ অথবা ধর্মীয় স্থাপনার জন্য প্রদান করা হত সেগুলোতে সচরাচর উল্লেখ করা হত যে ভূমি দান করা হচ্ছে - উপরিকরস্বরূপ, দশাপরাধের শাস্তিস্বরূপ, পুলিশকর, সকল দায়মুক্তিসহ, সবধরনের নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈন্যদের প্রবেশ নিষেধসহ, সকল কর অব্যহতিসহ, রাজার প্রাপ্য সকল কর সহ, পতিত ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নীতি অনুসারে, যতদিন পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য বিরাজমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে।''[৭]

পাল সম্রাট দেবপালের মুঙ্গের তাম্রলিপি পাঠে দেখা যায় যে, মেষিকা নামের একটি গ্রাম দান করতে দিয়ে তাতে বলা হয়েছে ''স্বসীমা-তৃণযুতি-গোচর পর্যন্তঃ সতলঃ সোদ্দেশঃ সাম্রমধুকঃ সজলস্থলঃ সমৎস্যঃ সতৃণ.....অর্থাৎ, উল্লিখিত গ্রামে যে ভূমিদান করা হল তার নিচের স্বত্ব (সতলঃ) জলস্থলের স্বত্ব (সজলস্থলঃ সমৎস্য) এবং ভূমির উপরের গাছ গাছাড়া ও তৃণ (সতৃণঃ) ইত্যাদি সবকিছুই স্বত্বত্যাগ পূর্বক দান করা হয়েছে।[৮]

পাল যুগের অভিলেখমালাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ তাম্রপট্টোলির দানগ্রহীতা কিংবা জমির ক্রেতা ছিলেন ব্রাহ্মণ।[৯]

ধর্মীয় সংস্কৃতি ও বহুত্ববাদ:

প্রাচীন যুগে বৌদ্ধধর্মের নতুন নতুন রূপের বিস্তার ঘটেছিল মহাযান, বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান। পাল রাজারা ছিলেন মহাযান ও বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। অনেক লিপিতে ধর্মপাল, মহেন্দ্রপাল প্রভৃতি রাজাদের নামের পূর্বে ধর্মীয় উপাধি দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় চারশত বছরের পাল শাসনকালকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ

বলা যায়। ধর্মের উত্থান ও প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল এবং পারস্পারিক ঔদার্য ও সহনশীলতাও বজায় ছিল তার প্রমাণ রয়েছে সমকালীন বিভিন্ন রাজকীয় লিপিমালায়। পালরাজারা সকলেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণমূর্তি যেমন-শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও মন্দিরের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মপাল ও তৃতীয় বিগ্রহ পালের তাম্রলিপিতে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে নন্ন-নারায়ণের জন্য নির্মিত একটি মন্দিরের উল্লেখ আছে।[১০]

নারায়ণ পালের গরুড় স্তম্ভলিপি পাঠে ও বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্বের কথা জানা যায়।[১১] খালিমপুর লিপিতে একটি কাদম্বরী দেব কুলিকা বা স্বরস্বতী মন্দিরের উল্লেখ আছে।[১২] পাল যুগের লিপিমালাগুলোতে বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও পরশুরাম প্রভৃতি অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল বংশীয় রাজা ধর্ম পালের মহাবোধি প্রশস্তি লিপিতে উল্লেখ আছে যে, ধর্মপাল দেবের ২৬ রাজ্যাঙ্কে বুদ্ধগয়ায় একটি চর্তুমুখ শিবের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই চর্তুমুখ শিবের এক মুখ বিষ্ণুর, এক মুখ সূর্যের ও এক মুখ লক্ষীর।[১৩] তৎকালীন বিরাজমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই চর্তুমুখ শিবমূর্তি স্থাপন অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কারণ ধর্মপালের মত একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা বুদ্ধগয়ায় শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এতে বাংলার শাসকবর্গের ধর্মীয় উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় ভূমিদানকারী রাজা রাজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা সরাসরি ঘোষণা করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলি। বিক্রমশীল মহাবিহার, সোমপুর, নালন্দা ও জগদ্দল মহাবিহার, ত্রৈকূটক বিহার, দেবীকোট বিহার, পন্ডিত বিহার, সন্নগর বিহার, ফুল্লহরি বিহার, পট্টিকেরক বিহার, বিক্রমপুরী বিহার শুধু ধর্মচর্চা নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত, যা বিভিন্ন লিপি থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়।

শিক্ষা ও পান্ডিত্যচর্চা:

পাল যুগের বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। এখানে সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ের ওপরই শিক্ষা লাভ করত না বরং জ্ঞানের প্রতিটি শাখা যেমন- দর্শন, চর্তুবেদ, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতিষিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়সমূহের ওপর পান্ডিত্যচর্চা করতেন। এসকল পান্ডিত্যচর্চা সম্পাদন করা হত বিখ্যাত বিহারসমূহে যা আমরা তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থ তালিকা হতে জানতে পারি। এসব বিহার গুলিতে বৌদ্ধ আচার্য, উপাধ্যায়, ভিক্ষু, অভিধর্মকোষ বিশারদ ইত্যাদি উপাধিধারী ব্যক্তি বর্গ এবং সাধারণ শিক্ষার্থী বসবাস করতেন। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুদানপত্রে পান্ডিত্যচর্চার প্রতি সম্মান ও উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময় কয়েকজন বৌদ্ধ আচার্য বৌদ্ধ বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে শীলভদ্র, শবরীপাদ, টঙ্কদাস, নাগবোধি, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞান শ্রী-মিত্র, দিবাকার চন্দ্র এর নাম এখনও বাংলার স্বর্ণযুগের স্মৃতিকে জাগ্রত করে। এ বৌদ্ধ আচার্যগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্বের প্রভাব দৃশ্যমান। চৈনিক ও তিব্বতীয় বিবরণী ও ঐতিহ্য থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য থেকে অনেক ছাত্র শুধু বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা গ্রহণের জন্যই আসত না বরং অন্যান্য বিষয়ের উপর ও শিক্ষা লাভের জন্য আসত।[১৪] এখান থেকেই বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বত, নেপাল ও আরাকানে বিস্তার লাভ করেছিল। বাংলার শিলালিপিমালাসমূহ থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও মঠ বা শিক্ষাকেন্দ্রীয়গুলো পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত। শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ব্রাহ্মণ্যধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হত। অনিরুদ্ধ, হলায়ুধ, ভট্ট ভবদেব, জীমুতবাহনের মতো প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত পন্ডিতদের সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ছাড়াও আরও দুটি বর্ণ করণকায়েস্থ ও বৈদ্য শিক্ষিত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হত। পাল আমলে অসংখ্য মহাযানী-বজ্রযানী-মন্ত্রযানী-সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা প্রকাশ করেছিলেন সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত অগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন।

বৌদ্ধতান্ত্রিক তত্ত্ব:

লামা তারানাথের মতে মহাযান পন্থা প্রবর্তনের সময়ে নাগার্জুনের উদ্যোগে যে শক্তিপূজা পদ্ধতি প্রচলিত হয় তন্ত্রের বীজ তার মধ্যে নিহিত ছিল।[১৫] শক্তিপূজা বির্বতিত হতে হতে মহাযান মতের এক নতুন শাখায় পরিণত হয়।[১৬] ৭৫১

খ্রিস্টাব্দে সমগ্র মধ্য-এশিয়ার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে অসংখ্য বৌদ্ধ শরণার্থীর সঙ্গে কয়েকজন তান্ত্রিক চলে আসেন তিব্বত ও গৌড়ে।[১৭] ধর্মপাল তখন গৌড়েশ্বর এবং তিনি তাদের আশ্রয় দেন। তান্ত্রিকদের বাহ্যিক রূপ লোককে স্তম্ভিত করলে ও তাদের শাস্ত্রগুলি পাঠ করে সুধীসমাজ চমৎকৃত হয়। রাজশক্তির ও সমর্থন মেলে। এতে অবহেলিত তন্ত্রবাদ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য পালরাজ্যের সকল স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয় এবং সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু তান্ত্রিক নতুন মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে চলে যান।[১৮] আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ছিল কঠোর নিয়মের অধীন, এটি ছিল নৈতিক শৃঙ্খলা ও ধ্যানের ধর্ম। কিন্তু এটি সাধারণের মন আকর্ষণ করতে পারত না; তাই সাধারণের দৃষ্টি আকষর্ণের জন্য বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্র, মুদ্রা, মন্ডল প্রবর্তিত হয়। এভাবে বৌদ্ধধর্মে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। যার সাধারণ পরিচয় তান্ত্রিকতা।[১৯] বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করার জন্য অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব হতেই এটি বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়ে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার জনমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই ধর্ম বিশ্বাসই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামেই পরিচিত।

'ড. নীহাররঞ্জন রায়' লিখেছেন-

> ''পর্বতকান্তারবাসী সর্ববৃহৎ কৌমসমাজকে বৌদ্ধধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করার জন্য ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, মাতৃকাতন্ত্রের নানা দেবদেবী অসঙ্গ মহাযান দেবায়তনে স্থান দান করেছিলেন।''[২০]

এছাড়াও বৌদ্ধধর্মের যে বিবর্তন ঘটেছিল এর নেতৃত্ব যারা দিয়েছেন তাদের বলা হয় সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। এরা সংখ্যায়-চুরাশি জন। এদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতি। গৌড় তান্ত্রিকগণ বৈরোচনার সঙ্গে তারারও উপাসনা করত। পালযুগের শেষভাগেই আদ্যশক্তি তারাই তাদের প্রধান উপাস্যা দেবীতে পরিণত হন। তাতে সাধকের মনে শক্তি বাড়ে, সাধনায় মাধুর্য্য আসে। কিন্তু কালচক্রতন্ত্রের প্রর্বতনের পর থেকে তান্ত্রিকদের মধ্যে ব্যভিচার দেখা দেয়। সুম্পা খাম্পো বলেন, মহীপালের রাজত্বকালে (১০১৫-১০৪০ খ্রিস্টাব্দ) কালচক্রতন্ত্র ভিক্ষু শিলুপা কতৃক সম্ভল থেকে গৌড়ে আনীত হয়। গৌড় ও মগধের বিভিন্ন মহাবিহার থেকে তারাতন্ত্র, হেবজ্রতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তান্ত্রিকতার এক আধ্যাত্নিক ও বৈজ্ঞানিক দিক আছে, কিন্তু সেগুলি বিহার ও বিদ্যালয়ের প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকায় গুরু-পুরোহিতগণ একে বিকৃতরূপ দিয়ে জন সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। প্রাচীন বাংলায় অষ্টম শতাব্দী থেকে তান্ত্রিকতত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলো ছিল মূলত বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের জন্যই লিখিত। কাজেই তন্ত্র সাধনার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এতে রয়েছে তারা, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও অন্যান্য দেব-দেবীর স্তোত্র, সাধনা, পূজাবিধি প্রভৃতি। বৌদ্ধ তন্ত্র বহুলাংশে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রগ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ দেব-দেবীর স্তোত্র, সঙ্গীতি মন্ত্র, মুদ্রা, মন্ডল, ধারণী, যোগ ও সমাধি ইত্যাদি মিলে বৌদ্ধতন্ত্রের একটি বিশেষ পর্যায় উন্মোচিত হয়েছে পাল যুগে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, মহাধ্যক্ষ জ্ঞাননশ্রীমিত্র, অভয়াকরগুপ্ত, দিবাকরচন্দ্র, কুমারবজ্র, টঙ্কদাশ বা ডঙ্কদাশ, প্রজ্ঞাবর্মন এসমস্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্যের মাধ্যমে বাংলার তান্ত্রিক মতবাদে একটি নতুন ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে।

অর্থনীতি ও জীবিকা:

পাল শাসনামলে ভূমি ভিত্তিক অর্থনীতির মূল বিষয় ছিল কৃষি। তাম্রলিপিগুলিতে ভূমির পরিমাপ, পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবহৃত একক (যেমন-দ্রোণ, খর, নিরবরণ, উন্মান, কাকিনী) এবং কৃষিজ ফসল বা খাজনার পরিমাণের উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় তৎকালীন সমাজ ছিল কৃষিনির্ভর। প্রাচীন বাংলায় লোকেরা বেশির ভাগ গ্রামে বাস করত এবং চারপাশের জমি চাষ করে নানা শস্য ও ফসলাদি উৎপাদন করত। এ কৃষিকর্মে সকল জাতির লোক লিপ্ত থাকত। প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন লেখমালা হতে বোঝা যায় কৃষি ধান চাষের একমাত্র উপায় ছিল। সন্ধ্যাকার নন্দীর ''রামচরিত'' কাব্যে বিভিন্ন ধরনের ধানের উল্লেখ আছে। এই ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী, বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পারিক সম্বন্ধ নির্ণয় হয়েছে। কৃষকরাও গ্রামীন অন্যান্য শ্রেণীর মত একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল। গ্রামীন অর্থনীতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে পাল রাজবংশের যেসব তাম্রলিপি পাওয়া যায় তার প্রায় সবগুলোতেই দানকৃত এবং এতে প্রধান প্রধান কৃষিজাত

ফসলের উল্লেখ আছে। আজকের মত প্রাচীনকালেও বাংলাদেশের প্রধান শস্য ছিল ধান এবং অন্যান্য শস্য যা আমরা অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সমস্তলেখ মালাগুলি এবং রামচরিত ও অন্যান্য গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি। ধান ছাড়া অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল সর্ষে, ডাল এবং ইক্ষু বা আখ। সন্ধ্যাকার নন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি প্রশস্তিতে ধান মাড়াই এর ইঙ্গিত রয়েছে।[২১]

প্রাচীন বাংলার অপর একটি উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্য ইক্ষু। জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশে ইক্ষু সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। ইক্ষু বা আখ বেশি উৎপন্ন হতো বরেন্দ্র অঞ্চলে। তাই সন্ধ্যাকরনন্দী তার রামচরিত গ্রন্থে বলেছেন বরেন্দ্রের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম উপকরণ ছিল ইক্ষুক্ষেত বা আখের খেত।[২২] এছাড়া 'সুভাষিতরত্নকোষ এ আমরা পুন্ড্রে ইক্ষুর উল্লেখ পাই।[২৩] আখের রস দিয়ে চিনি ও রস তৈরি হত। মহুয়ার চাষ হত উত্তরবঙ্গে। পাল ও সেন রাজাদের তাম্রলিপিতে আম ও কাঠাল চাষের প্রচুর উল্লেখ রয়েছে।[২৪] দেব পালের মুঙ্গের তাম্রশাসন ও নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনের আমের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব উল্লেখ থেকে গবেষকরা অনুমান করেছেন তৎকালীন সময়ে আম অনেক জনপ্রিয় ফল ছিল।[২৫] কাঁঠাল জন্মাত পূর্ব বাংলার ঢাকা অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে বরেন্দ্রীতে এলাচ এবং লবঙ্গের চাষ হত।[২৬] প্রাচীন কালে তুলা ও পাটের চাষ ও হত। রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি জাদুঘরে অনেকগুলো কষ্টি পাথর নির্মিত চন্ডীমূর্তির দু'পাশে কলাগাছের প্রতিকৃতি রয়েছে।[২৭] খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের তাম্রলিপি হতে জানা যায় দেশের সর্বত্র গুবাক ও নালিকের (নারিকেল) প্রচুর উৎপন্ন হত।[২৮] সে সময় তুলা ছিল অপর একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে কৌঞ্জশুভ্র গ্রামের সে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এক লেবু বনের উল্লেখ আছে।[২৯] এসকল ভূমিজাত দ্রব্যাদিই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ।

অষ্টম শতক পরবর্তী লিপিগুলোতে অনেক স্থলেই হাট-বাজার সমেত জমি দান করার কথা উল্লেখ করা হয়।[৩০] ইরদা লিপি, দামোদার লিপি, ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, গোবিন্দকেশবের ভাটেরা লিপি প্রভৃতিতেও হাট-বাজার সমেত ভূমি বা গ্রাম দান-বিক্রয়ের উল্লেখ দেখা যায়।[৩১] এইসব গ্রাম ও গ্রামান্তরের হাটে স্থানীয় উৎপন্ন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হত। প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল যা জলপথ ও স্থলপথ উত্তর পথেই চলত। বাংলার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য জলপথে চলত তাই এদেশের নদীগুলোর তীরে হাট ও গঞ্জ এবং নতুন নতুন নগর ও বন্দর গড়ে উঠেছিল। লিপি মালায় হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি রাজ কর্মচারীর নাম উল্লিখিত হয়েছে যা থেকে বোঝা যায় ব্যবসা ও বাণিজ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যথেষ্ট অর্থাগম হত।[৩২]

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন তাম্রলিপি পাঠ করলে আর ও একটি অর্থকরী পণ্যের নাম পাওয়া যায় সেটি হল লবণ। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রলিপি, নয়পালের ইর্দা তাম্রলিপিতে লবণ উৎপাদনের প্রচুর উল্লেখ আছে। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতির অন্যতম একটি উৎপাদন হল মাছ বা মৎস্য। বিভিন্ন তাম্রলিপি পাঠ করলে দেখা যায় যে, যখনই ভূমি দান করা হয়েছে তাতে সজল অর্থাৎ জলাধার, খাল, বিল, নালা পুষ্করিণী ইত্যাদি দান করা হয়েছে। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে এর উল্লেখ আছে।

এছাড়া প্রাচীন বাংলায় অর্থোৎপাদনের একটি অন্যতম উপায় ছিল অরণ্য সম্পদ, মদনপালদেবের মনহলি তাম্রলিপিতে এর উল্লেখ আছে। কাঠের সাথে সাথে আর একটি অর্থকরী পণ্য বাঁশ। তাম্রলিপি তে উলেস্নখিত 'সঝাট-বিটপঃ' শব্দদ্বয়ের দ্বারা নিশ্চিতভাবে বাঁশঝাড় ও অন্যান্য গাছের ইঙ্গিত করা হয়েছে। রামচরিতে বলা হয়েছে খুব ভালো বাঁর্শের ঝাড় ছিল বরেন্দ্রীতে। তেজপাত উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে ও সিলেট বা শ্রীহট্টে প্রচুর উৎপন্ন হত।

পালযুগে বাংলার সমাজ কৃষি নির্ভর হলেও কালক্রমে বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও হস্তশিল্প এখানে গড়ে উঠে। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা বস্ত্র শিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। বঙ্গে ও পুন্ড্রে চারপ্রকার বস্ত্রশিল্প ছিল ক্ষোম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক। এছাড়া এদেশে বিভিন্ন ধরণের শিল্পকলা, হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের অস্তিত্ব যে অতি উচ্চতায় পৌঁছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ও আকারের মৃৎপাত্রে, পোড়ামাটির ফলকে, ধাতুনির্মিত শিল্পকর্মে এবং অষ্টধাতু ও প্রস্তর নির্মিত ভাস্কর্যে। অপর উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল লৌহশিল্প কিছু কিছু তাম্র লিপিতে কর্মকার শ্রেণীকে রাজ পাদোপজীবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লৌহশিল্প না থাকলে কৃষিকর্ম ও কৃষি সমাজ যে অচল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন দা, কুড়াল, কোদালি, খন্তা, খুড়পি, লাঙল, তীর, বর্শা,

তলোয়ার ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র ও তৈরি হতো। এছাড়াও ইদিলপুর তাম্রলিপিতে লৌহনির্মিত জলপাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৩] এছাড়া বাংলায় কুম্ভাকার নির্মিত মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন তাম্রলিপির উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় যে, কুম্ভাকারবৃত্তি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। পোড়ামাটির নানা প্রকারের থালা, বাটি, জলপাত্র. রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাড়াহপুর সহ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননস্থলে বিপুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে যা বিস্তৃত ও উন্নতমানের মৃৎশিল্পের পরিচয় বহন করে।

বাংলার প্রাচীন অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান ছিল নৌশিল্প তথা পোতনির্মার্ণ শিল্পের। এ পোত বা নৌশিল্পের মাধ্যমে নদীগামী বা সমুদ্রগামী পোতাদি নির্মার্ণ করা হতো। পাল লিপিমালা গুলোতে 'নৌবাট','নৌবিতান' শব্দের উল্লেখ রয়েছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে সে সময় রাজ বংশের সামরিক শক্তি নৌ বাহিনীর ওপর নির্ভর করত।

শিল্প ও স্থাপত্যচর্চা:

পাল যুগের গৌরবের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শিল্পকলার মাধ্যমেই প্রকাশ ঘটে পাল যুগের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অভিব্যক্তির স্থাপত্য, পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য আর চিত্রকলায় পাল যুগের বিশেষ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। পাল সম্রাট ধর্মপালের স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধবিহার। বর্গাকার ক্ষেত্র, প্রতি বাহু প্রায় এক হাজার ফুট, চারদিকে বৌদ্ধ শ্রমণদের অসংখ্য আবাসকক্ষ আর প্রাঙ্গনের মাঝে ক্রুশাকৃতির ক্রমশহ্রাসমান অবয়বে দাড়িয়ে থাকা কেন্দ্রীয় মন্দির বা উপসনা সৌধ। নালন্দা লিপিতে এটিকে 'জগতাম নেত্রৈক বিশ্রামভূ' (জগতের চোখে তৃপ্তিদায়ক বা দৃষ্টি নন্দন) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক পাল যুগে এই শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ বহন করে। দেয়াল গাত্রালংকারে ব্যবহৃত এই ফলক সমূহ বাংলার মৃৎশিল্পীদের অনন্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও এই ফলকসমূহে স্থান পেয়েছে বাংলার জন জীবনের অনেক দৃশ্য। তাই শৈল্পিক মূল্য ছাড়াও ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে এদের মূল্য অপরিসীম। পাল যুগের শিল্পকলার মধ্যে ভাস্কর্য শিল্পের প্রভুত অগ্রগতি ঘটেছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতায় পাল সম্রাটদের পৃষ্টপোষকতায় বাংলার ভাস্কর্য শিল্প এ যুগে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে যাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 'পাল স্কুল অব স্কাল্পচারাল আর্ট' বলে।[৩৫]

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও পাল যুগ পিছিয়ে ছিল না। পাল যুগের পূর্বের কোন চিত্র কলার নিদর্শন বাংলাতে পাওয়া যায় নি। মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপত্যের অলংকরণে দেয়াল চিত্রের নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত লামা তারানাথের গ্রন্থে পাল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্ব কালের দুই বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ধীমান ও তাঁর ছেলে বীটপালের উল্লেখ রয়েছে। একাধারে প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পে তারা পারদর্শী ছিলেন। বজ্রযান ও তন্ত্রযান বৌদ্ধ মতের বহু পান্ডুলিপিতে বৌদ্ধ দেব-দেবতার রূপ চিত্রের মাধ্যমে মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়ের ২৪টি চিত্রিত বৌদ্ধ পান্ডুলিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে- পঞ্চরক্ষা, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা প্রমুখ বৌদ্ধ গ্রন্থের। এসব পান্ডুলিপির চারশতাধিক চিত্রের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে পাল যুগের চিত্রকলা। এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব-ভারতীয়, নেপালি এবং তিব্বতি চিত্রকলায় পাল যুগের চিত্রকলার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন চিত্রকলার বিশেষজ্ঞগণ। বৌদ্ধ গ্রন্থের চিত্রিত পান্ডুলিপি এবং চিত্রকলার নিদর্শনগুলোর উপাদান হচ্ছে তালপাতা বা তাল পত্র। চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু বৃক্ষের জীবন কথা এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীকূল। শ্বেত, পীত, লাল, কালো এবং বিভিন্ন মিশ্রিত বর্ণ দিয়ে পান্ডুলিপির পাতায় এসকল চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও পাল যুগে বাংলায় প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। পাল যুগের অসংখ্য তাম্রশাসনে বা লিপিমালায় বিধৃত প্রশস্তি অংশে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ও শৈল্পিকমানসম্পন্ন কাজ রচনার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি অভিনন্দ কতৃক বৈদর্ভী রীতিতে রচিত 'রামচরিতম'মহাকাব্য সাহিত্যাসরে সমাদৃত হয়েছিল। শেষ পালসম্রাট মদন পালের পৃষ্ঠ পোষকতায় রচিত হয়েছিল বরেন্দ্রের কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর ''রামচিরতম'' কাব্য। এক বিরল কাব্যরীতি অনুসরণ করে এই দ্ব্যর্থবোধক কাব্যটিকে একদিকে বাল্মিকীর রামায়ণ কাহিনী অন্যদিকে পালসম্রাট রাম পালের কাহিণীকে এক করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় লেখনীর ও প্রমাণ পাওয়া যায়। দর্শন শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থ 'আগমশাস্ত্র' নামে বহুল পরিচিত 'গৌড়পাদকারিকা' রচনা করেছিলেন গৌড়পাদ, বর্ধমানের ভুরিশ্রেষ্ঠী গ্রামের শ্রীধর ভট্ট রচনা করেছিলেন 'ন্যায় কন্ডলি'। পাল সম্রাট নয়পালের কর্মচারী নারায়ণ দত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন

করেছিলেন চিকিৎসা সংগ্রহ, আয়ুর্বেদদীপিকা, ভানুমতী, শব্দ চন্দ্রিকা ও দ্রব্য গুণসংগ্রহ। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শব্দ প্রদীপ এর গ্রন্থাকার সুরেশ্বর ছিলেন পাল রাজ পরিবারের চিকিৎসক ও তাঁর পিতা ভদ্রেশ্বর ছিলেন সম্রাট রামপালের চিকিৎসক। সুরেশ্বরের অন্যান্য রচনা বৃক্ষায়ুবেদ এবং লোহ পদ্ধতি। ধর্মশাস্ত্রে অবদান রেখেছিলেন জীমুতবাহন তার ''দায়ভাগ, ব্যবহার-মাতৃকা ও কালবিবেক গ্রন্থদ্বয়ের মাধ্যমে।[৩৬]

ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন:

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিহারে বসবাসকারী বহু বৌদ্ধ আচার্যধর্মীয় গ্রন্থ এবং দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতি বিজ্ঞান, তর্ক বিদ্যা সম্পর্কেও গ্রন্থ প্রণীত হয়েছিল সংস্কৃত বা অপভ্রংশ কিংবা প্রাচীন বাংলা ভাষায়। পাল লিপির ভাষা মূলত সংস্কৃত হলেও প্রয়োজনে প্রাকৃত ও দেশজ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রাকৃত ভাষা থেকে ১০ম হতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় সংস্কৃত ভাষায়। কোন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্রও ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। করণ-কায়স্থ বর্ণভুক্ত সন্ধ্যাকরনন্দীর বিরচিত রামচরিতম বাংলাদেশে লেখা প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ যে গ্রন্থে রামপাল কর্তৃক কৈবর্ত্য প্রধানদের অধিকার হতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। তার ঐতিহাসিক কাব্যে তিনি বরেন্দ্রীর প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, জনগণ, নগর ও গ্রাম এবং ধনসম্পদের বিবরণ ও লিখেছেন। সন্ধ্যাকর নিজেকে কলিযুগে বাল্মিকী রূপে দাবী করেছেন। যদিও এই দাবী তার দম্ভ প্রকাশ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে তবু বাংলার ইতিহাসতত্ত্বের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।[৩৭]

পাল যুগে সাহিত্যে শ্রম্নতিমাধুর্য বজায় রাখা হয়েছে। পাল যুগের লিপিমালাতে ব্যবহৃত বহু শ্লোকময় রচনায় চমৎকার ছন্দ ও অলঙ্কার লক্ষণীয়।

উপসংহার:

পাল শাসনামলে প্রাচীন বাংলার লিপিমালা বিশেস্নষণে দেখা যায় যে, প্রাচীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে পাল যুগের অবদান অপরিসীম। পাল শাসনামলে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিরাজ করার ফলে বাংলায় শিক্ষাদীক্ষা, নৈতিক অবস্থান একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাড়িয়েছিল। অর্থনীতির অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের ও পুনরুজ্জীবন ঘটে। পালরাজারা বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে সুসমন্বিত সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে। যার প্রতিফলন পাল যুগের লিপিমালায় ইতিবাচকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. হোসেন শাহানারা । প্রাচীন বাংলার ইতিহাস। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২,প. ৩৮।
২. রায় নীহার রঞ্জন । বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব। কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮০, প. ৩২১।
৩. ঐ, পৃ. ৩২১।
৪. মজুমদার সুপ্তিকণা। বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ: ৫৬।
৫. শাহানারা হোসেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
৬. Morrison Barrie. M. Political Centers and Cultural Regions on Early Bengal. Tucson, 1970, উদ্ধৃত: ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: বাংলাবাজার, ২০০২, প. ১০৩।
৭. Majumdar R.C. History of Ancient Bengal. Calcutta, 1974, P-335.
৮. মৈত্রেয় অক্ষয় কুমার। গৌড়লেখমালা। রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পৃ: ৩৯।
৯. মতিন মোঃ আবদুল। শিলালেখ-তাম্রশাসনাদিতে প্রাচীন বাংলার গ্রাম-স্থাননাম ও সমাজ। জার্নাল অব. রাজশাহী কলেজ, ভলিউম ১, নম্বর ১ এবং ২, ২০২৩, পৃ. ১৮১।
১০. মৈত্রেয় অক্ষয় কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।
১১. ঐ, পৃ: ৭০।

১২. রায় নীহার রঞ্জন। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১১।
১৩. মৈত্রেয় অক্ষয় কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩২।
১৪. হোসেন শাহানারা। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯।
১৫. ঘোষ শৈলেন্দ্রকুমার। গৌড় কাহিনী, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ২০৮।
১৬. Waddcll L. A. Budhism in Tibet. P-56-57, উদ্ধৃত: শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৯।
১৭. শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
১৮. Conz. E. Budhism its essence and development. P-179, উদ্ধৃত: শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।
১৯. The Cultural Heritage of India V.IV.1969, P. 260-262, উদ্ধৃত: প্রণব কুমার বড়ুয়া, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ৪২।
২০. বড়ুয়া প্রণব কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২১. মিশ্র চিত্তরঞ্জন। রামচরিত কাব্যে বর্ণিত বরেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আবুল কাশেম (সম্পা.) স্থানীয় ইতিহাস, রাজশাহী: হেরিটেজ আর্কাইভ অব. বাংলাদেশ হিস্ট্রি ট্রাস্ট, পৃ. ১।
২২. মজুমদার সুপ্তিকণা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
২৩. হোসেন শাহানারা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
২৪. মজুমদার সুপ্তিকণা। প্রাগুক্ত, প. ১৪২।
২৫. আক্তার মোছা: সাহিনা। প্রাচীন বাংলার খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস: সাহিত্য নির্ভর অনুসন্ধান। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব. আর্টস এন্ড ল, ভলিউম ৪৯ (২০২১), পৃ. ৫।
২৬. হোসেন শাহানারা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
২৭. সেন শ্রীকুমার। বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৮৬-২৮৭।
২৮. মজুমদার সুপ্তিকণ। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।
২৯. মৈত্রেয় অক্ষয় কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।
৩০. রায় নীহার রঞ্জন। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।
৩১. ঐ, পৃ. ২২৬।
৩২. হোসেন শাহানারা। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
৩৩. মজুমদার সুপ্তিকণা। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।
৩৪. চৌধুরী ড. আবদুল মমিন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫।
৩৫. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।
৩৬. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।
৩৭. মিশ্র চিত্তরঞ্জন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৫